মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ তথ্য ও সত্য

ড. কুতুব উদ্দিন হালদার

একবিংশ শতকে সর্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্তির পর সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি প্রাসঙ্গিক। উন্নত ও উন্নয়নশীল বহু দেশ দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা হল শিক্ষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর। এই স্তরের শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের একাংশ সরাসরি জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর অপর অংশ উচ্চশিক্ষার পথে পাড়ি দেয়। কেবলমাত্র আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান, জার্মানি, কানাডার মতো উন্নত দেশগুলি নয় তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলিও ইতিমধ্যে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষায় সকল শিশুর অন্তর্ভুক্তি এবং গুণমানে উন্নত শিক্ষার আকাঙ্খায় ২০০৯ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে। এটি ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকরী হয়েছে। আশা করা হয়েছে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর উন্নত মানের মাধ্যমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। এই স্তরের শিক্ষার তিনটি দিক—১. পরিমাণ (Quantity), ২. গুণমান (Quality) এবং ৩. সমতা (Equity) আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক।

মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিমাণগত দিক বলতে এই স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করার উপযুক্ত বয়সের সমস্ত শিশুকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি (Enrolled) করা এবং সকল শিশু যাতে এই স্তরের শিক্ষা অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করে তার ব্যবস্থা করাকে বোঝান হয়। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর যাতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মাঝখানে কোনো শিশু ড্রপ-আউট না হয় অর্থাৎ ছেড়ে না চলে যায় সেই দিকটাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো। এছাড়া প্রতিটি শিশু যাতে তার নিজের বাড়ি থেকে সহজে বিদ্যালয়ে পৌঁছোতে পারে সেইরূপ স্থানে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় অনেক বেড়েছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংখ্যাও বেড়েছে। জাতীয়স্তরে মাধ্যমিকে পড়ার উপযুক্ত বয়সের প্রতি দু-জন শিশুর মধ্যে একজন মাধ্যমিক শিক্ষার আওতায় এসেছে (Net Enrolment Ratio in India-48.46% এবং পশ্চিমবঙ্গে NER-46.36%)। আবার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পড়ার উপযুক্ত বয়সের প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করেছে। সামগ্রিকভাবে সমগ্র ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই হারের বিশেষ পার্থক্য নেই। সমগ্র ভারতে উচ্চমাধ্যমিকে NER হল ৩২.৮২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ইহা ৩২.৬৭ শতাংশ।

Scanned with CamScanner

Selected Educational Statistics 2014-15-এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ড্রপ-আউটের হার কমেছে। যদিও এখনও গড়ে প্রতি একশ জন শিশু প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হলে তাদের মধ্যে 47.4 জন দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ সমাপ্ত করার পূর্বে পড়া ছেড়ে দেয়। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। আবার তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার সর্বাধিক (সারণি-১)।

সারণি-১

ভারতের উচ্চমাধ্যমিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়েদের ড্রপ-আউটের হার, ২০১৪-১৫

	ছেলে (%)	মেয়ে (%)	মোট (%)
সাধারণ সম্প্রদায়	48.1	46.7	47.4
তফসিলি জাতি	51.8	48.0	50.1
তফসিলি উপজাতি	63.2	61.4	62.4

উৎস : Selected Educational Statistics, 2014-15

এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল স্বাধীনতার পর থেকে একবিংশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত শিক্ষায় প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার বেশি ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের তথ্যে ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেয়েদের চাইতে ছেলেদের মধ্যে ড্রপ-আউট বেশি। সামাজিক ন্যায় বিচার অথবা সমতার (Equity) প্রশ্নে ধারাবাহিকভাবে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে কোঠারি কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) সুপারিশের পরবর্তী সময়ের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে জাতিগত ও লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন আদিবাসী শিশুদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন, মহিলা সামাক্ষা; মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য জাতীয় উৎসাহমূলক কর্মসূচি (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education), একমাত্র কন্যাশিশু শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি। রাজ্যস্তরেও নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি বা উদ্যোগ নেওয়ার ফলে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং মেয়েদের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার কমতে পারে। তবে ছেলেদের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার বেশি হওয়ার মুখ্য কারণ দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক। ১৪/১৫ বৎসর বয়সের ছেলেরা পরিবারে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে। অনেকেই মনে করেন দারিদ্র হল নিয়তি বা কপাল। ঈশ্বর দরিদ্র করেই পৃথিবীতে তাঁদের পাঠিয়েছেন। তাদের পূর্বজন্মের বা পূর্বপুরুষের পাপের ফলে তারা দরিদ্র হয়েছে। পরজন্মে সুখ হবে। লেখাপড়াটা সকলের কপালে বা নিয়তিতে নেই—এইরকম বদ্ধমূল ধারণাও আছে। সামাজিক ব্যবস্থাপনাই দারিদ্র্যের কারণ—এই সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যটাই অনেকেরই অজানা।

Scanned with CamScanner

ভারত গরিবের দেশ। পশ্চিমবঙ্গ গরিবের রাজ্য—এমন নয়, ভারতেও কোটিপতির অভাব নেই। শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বেও আর্থিক বণ্টনে ব্যাপক বৈষম্য আছে। The World Economic Forum-এর সাম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী আর্থিক মাপকাঠিতে উপরের দিকের এক শতাংশ মানুষ বিশ্বের মোট সম্পদের ৪৮ শতাংশের মালিক। ২০১৪ সালের অপর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নীচের দিকের ৫০ শতাংশ গরীব জনগণের মোট সম্পদের সমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধনী ৮৫ জন ব্যক্তির মোট সম্পদ। অর্থাৎ বিশ্বে দরিদ্র ৩৫০ কোটি দরিদ্র মানুষের যা সম্পদ আছে ধনী ৮৫ জন ব্যক্তির সেই সম্পদ আছে। প্ল্যানিং কমিশনের মতে ভারতের সামগ্রিকভাবে গড় আয় বাড়লেও ধনী-দরিদ্রের ফারাক বা ব্যবধান বেড়েছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে আর্থিক বিচারে উপরের দিকে থাকা ভারতের পাঁচ শতাংশ জনগণ মোট সম্পদের ৩৮ শতাংশ ভোগ করে। আবার উল্টোদিকে নীচের দিকের ৬০ শতাংশ জনগণ মাত্র ১৩ শতাংশ ভোগ করে। শহরে নীচের দিকে থাকা ৬০ শতাংশ জনগণ মাত্র ১০ শতাংশ সম্পদ ভোগ করে। অর্থনৈতিক এই অসমতার জন্য দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। সকলেই বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারে না। যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের সকলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না।

আবার যারা ড্রপ-আউট হল না মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করল তাদের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয় করা খুবই সহজ নয়। গুণগত মানটি অনেকটা বিমূর্ত এবং আপেক্ষিক। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। সেইসাথে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতাও মুখ্য পরিমাপক হিসেবে ধরা হয়। কত শতাংশ বিদ্যালয়ে কী ধরণের পরিকাঠামোগত সুবিধা আছে তা সারণি-২ তে দেখানো হল। দেখা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সিংহভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ, বিদ্যুৎ সংযোগ ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচালয়, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য আলাদা ঘর এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের ৭৮ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এবং ৪২.৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে ইণ্টারনেট আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল ঐ কম্পিউটার কি ক্লাসরুমে পড়ানোর জন্য কাজে লাগে? ক্লাসরুমে পড়ানোর সময় কাজে লাগানো যায় এমন ব্যবস্থা আছে? এককথায় না। ক্লাসরুমে ব্যবহারের জন্য যে সংখ্যায় কম্পিউটার থাকা দরকার তা নেই। প্রোজেক্টার মেশিনও নেই। বিদ্যালয়ে শৌচাগার থাকলেও বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে তা ব্যবহারের উপযোগী নয়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেরও করুণ দশা। সমগ্র ভারতে ১৬% মাধ্যমিক এবং ২৪.৪% উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক আছে। পশ্চিমবঙ্গে তা যথাক্রমে ১৯.৮% এবং ২৮.২৭%।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত অপর একটি পরিকাঠামোগত

Scanned with CamScanner

সারণি-২

সমগ্র ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোগত সুবিধাসমূহ, ২০১৪

পরিকাঠামোগত সুবিধাসমূহ	মাধ্যমিক বিদ্যালয় (শতাংশ)		উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (শতাংশ)	
	সমগ্র ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	সমগ্র ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
বিদ্যালয়ে প্রাচীর আছে	৮৩.৭৮	৭৮.৪৬	৮৯.৩২	৭৬.০১
খেলার মাঠ আছে	৭৭.৩৯	৬৩.৬৫	৭৯.৬৩	৬৭.৬৩
প্রধান শিক্ষকের পৃথক কক্ষ আছে	৭৪.৫৭	৬২:৪২	৮০:৪১	৬৫.০
বালকদের শৌচালয় আছে	৯৩.৬৩	৯৭.৬৫	৯৬.৫৫	৯৭.৭৩
বালিকাদের শৌচালয় আছে	৯৬.৫৩	৯৯.৩৩	৯৭.৪৩	৯৯.৫২
বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎসংযোগ আছে	৮৭.৭	৯৬.২৫	৯২.৫৬	৯৭.৭২
বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে	৬৬.৮২	৬৮.৬৮	৭১.৩৯	৭৮.০৬
বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট আছে	৩৬.৮৭	৩৪.২৪	৪৭.৮৭	৪২.৬
বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত আছে	১৬.০১	১৯.৮	২৪.৪৫	২৮.২৭
বিদ্যালয়ে পানীয়জলের ব্যবস্থা আছে	৯৮.৫৬	৯৯.৪৬	৯৯.২১	৯৯.৪৫

উৎস ঃ Flash Statistics, 2014.

নির্দ্ধারক হল পরীক্ষাগার (Laboratory)। এই স্তরের শিক্ষায় বিশেষীকরণ শুরু হয়। যুক্তি ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে। ১৭-১৮ বছর বয়সের শিক্ষার্থীরা বাস্তব ও যুক্তবাদী হয়। ফলে এই স্তরে পঠন-পাঠনে পরীক্ষাগার অপরিহার্য। সমগ্র ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের কত শতাংশ বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগার আছে তা সারণি-৩ এ দেখানো হল। এটা লক্ষণীয় যে, সামগ্রিকভাবে ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগারের সমস্যা আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যাটি খুব প্রকট। রাজ্যের খুবই অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগার আছে। আবার এইগুলি পরিপূর্ণ নয়। পরীক্ষাগার আছে কিন্তু পরীক্ষাগারের পরিপূর্ণ উপকরণ নেই।

শিক্ষার মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষকমণ্ডলী। সাধারণভাবে বলা যায় পাঠক্রিয়া পরিচালনা, শিক্ষার্থীকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলা, বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ গঠনের ভূমিকা পালন করে থাকেন শিক্ষকমণ্ডলী। বিভিন্ন গবেষণাতে দেখা গেছে বিদ্যালয়ে উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষকের অভাবে পঠন-পাঠন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। অবশ্য জাতীয়স্তরে গড়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর

Scanned with CamScanner

সারণি-৩

সমগ্র ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষাগার আছে, ২০১৪

বিষয় সমূহ		ভারত (শতাংশ)	পশ্চিমবঙ্গ (শতাংশ)
পদার্থবিজ্ঞান	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৩২.০৪	৩৫.৬৭
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৬৩.৪৪	১৮.২৫
রসায়ণ	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৩১.৯৫	৩৪.৯১
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৬৩.৫৭	১৭.৯৯
জীবনবিজ্ঞান	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৩০.৩৫	৩৫.৯৭
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৬৩.৭১	১৭.৫৭
কম্পিউটার	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৩৬.০৮	৩৫.৯১
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৬৪.৮	২১.৫
গণিতশাস্ত্র	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	১১.৬৪	২.৯৭
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	০.৬৭	০.৩৫
ভাষাবিজ্ঞান	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৭.৫১	২.৩৯
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৬৫.৩১	৩৩.৩৩
ভূগোল	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	১২.৬০	৪২.৪২
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৫১.৭১	১৫.০৭
গৃহ-বিজ্ঞান	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৭.৬	৩.৯১
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৫৯.৯০	১৮.০৮
মনোবিজ্ঞান	আলাদা পরীক্ষাগার আছে	৩.০৫	১.৪৪
	পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত উপকরণ আছে	৫৭.৮২	২৩.৯৬

উৎস ঃ সারণি-২ এ যেমন

অনুপাত আদৌ হতাশজনক নয়। কিন্তু রাজ্যভেদে পার্থক্য আছে। মিজোরাম, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, লাক্ষাদীপ ও গোয়াতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গড়ে প্রতি একজন শিক্ষক পিছু ১৫ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী আছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ৭২, ঝাড়খণ্ডে ৬৬, বিহারে ৬৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে আছে ৪৪ জন। মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে তা যথাক্রমে ৪০ ও ৩৩ জন। এই কয়টি রাজ্য ছাড়া সব রাজ্যে গড়ে প্রতি একজন শিক্ষক পিছু ২৮ জন বা তার চেয়ে অনেক কম শিক্ষার্থী আছে। (সারণি-৪) সুতরাং শিক্ষক কম আছে বলে পঠন-পাঠনের সমস্যা হয়—এই অভিমত সার্বিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু বিদ্যালয়ভেদে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের অসামঞ্জস্যতার কারণে পঠন-পাঠন ব্যাহত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপাতটি গড়ে ৪৪

Scanned with CamScanner

সারণি-৪

সমগ্র ভারত, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একত্রে প্রতি একজন শিক্ষক পিছু শিক্ষার্থী সংখ্যা, ২০১৪

রাজ্যের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা	রাজ্যের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা
মিজোরাম	১১	পাঞ্জাব	২১
লাক্ষাদ্বীপ	১১	চণ্ডীগড়	২২
মেঘালয়	১৪	তামিলনাড়ু	২৩
আসাম	১৫	অন্ধ্রপ্রদেশ	২৩
গোয়া	১৫	উত্তরাখণ্ড	২৪
মণিপুর	১৫	তেলাঙ্গানা	২৫
পুদুচেরী	১৬	অরুণাচল প্রদেশ	২৬
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১৬	দিল্লী	২৭
হিমাচলপ্রদেশ	১৭	মহারাষ্ট্র	২৮
হরিয়ানা	১৮	দাদরা নগর হাভেলী	২৮
কেরালা	১৮	রাজস্থান	২৮
নাগাল্যাণ্ড	১৮	ছত্রিশগড়	৩৩
কর্ণাটক	১৯	গুজরাট	৩৩
সিকিম	১৯	মধ্যপ্রদেশ	৪০
ত্রিপুরা	১৯	পশ্চিমবঙ্গ	৪৪
দমন দিউ	২০	বিহার	৬৪
জম্মু ও কাশ্মীর	২০	ঝাড়খণ্ড	৬৬
উড়িষ্যা	২০	উত্তরপ্রদেশ	৭২
		সমগ্র ভারত	**৩১**

উৎস ঃ সারণি-২ এ যেমন

হলেও এই রাজ্যের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক পিছু ১৫০ জন আবার অন্য বিদ্যালয়ে ১০-১১ জন বা তারও কম শিক্ষার্থী আছে। সুতরাং সমস্যাটা প্রধানতঃ ব্যবস্থাপনায়। এই অব্যবস্থাপনা সরাসরি শিক্ষার গুণমান কমিয়ে দেয়।

DISE-2014-15-এর তথ্য অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে বেশিরভাগ শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতাও যথেষ্ট ভাল। ভারতে গড়ে প্রতি ১০০ জন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৭২ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। ৭ জনের এম.ফিল / পি.এইচ.ডি. স্তরের গবেষণামূলক ডিগ্রি আছে। ৮৫ জন বি.এড. বা এম.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিকের ৫৮.৬% ও উচ্চমাধ্যমিকের ৬৮.৪১% শিক্ষক স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং অধিকাশ শিক্ষক পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। (সারণি-৫)

Scanned with CamScanner

সারণি-৫

সমগ্র ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা, ২০১৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাধ্যমিক বিদ্যালয়		উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	
	ভারত (শতাংশ)	পশ্চিমবঙ্গ (শতাংশ)	ভারত (শতাংশ)	পশ্চিমবঙ্গ (শতাংশ)
স্নাতক স্তরের কম	১১.২	১.৮৪	৫.৫১	১.৯৪
স্নাতক	৪২.৫৪	৩৭.৯১	১৫.৩৩	২৭.৫১
স্নাতকোত্তর	৪৩.৪৬	৫৮.৬০	৭১.৭৯	৬৮.৪১
এম.ফিল	১.৯১	১.২৮	৫.৫৫	১.৭৪
পি.এইচ.ডি. বা পোষ্ট ডক্টরেট	০.৭০	০.২১	১.২৮	০.৩৪
পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত	৮৬.১৮	৭৩.৪৪	৮৫.২২	৭৩.২৭

উৎস : *Flash Statistics, 2014.*

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সূচকগুলি শ্রেণিকক্ষের পাঠক্রিয়া প্রণালীকে সরাসরি প্রভাবিত করে। বিদ্যালয় পরিকাঠামোগুলির মধ্যে বিল্ডিং, গ্রন্থাগার, কম্পিউটার থাকুক বা নাই থাকুক ন্যূনতম সমস্ত শিশুর শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা থাকা চাই। সরকারি পরিকল্পনায় অনেক কর্মসূচি আছে কিন্তু কতটা কার্যকরী হয়? বাস্তব সত্য কি বলে? আসলে, শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের যে বেঞ্চগুলিতে বসে, সেখানে খাতা, বই, কলম, পেন্সিল, রাবার রেখে ক্লাসের নোট নেয়—সেগুলি উপযুক্ত নয়। কোথাও চারজনের বেঞ্চে পাঁচজন আবার কোথাও ছয়জন বসে। আবার এই বেঞ্চগুলি যথেষ্ট চওড়া নয়। শিক্ষার্থীদের স্কুলব্যাগ রাখার জায়গাও থাকে না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের হাঁটুর উপর ব্যাগ, ব্যাগের উপর খাতা রেখে ক্লাসনোট নেয়। তথ্যানুযায়ী প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎসংযোগ আছে। কিন্তু বাস্তবে বহু বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলিতে আলো বা পাখার ব্যবস্থা নেই। গরমের দিনগুলিতে অস্বস্তিকর একটা পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থী পাঠে অংশ নেয়। শ্রেণিকক্ষগুলি গতানুগতিকভাবে একঘেয়েমি বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠদান প্রক্রিয়ার উপযোগী। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠক্রিয়া পরিচালনার উপযোগী নয়। গ্রুপ-ডিসকাশান, প্রোজেক্ট পদ্ধতি, নির্মিতিমূলক পাঠদান পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠক্রিয়া পরিচালনার উপযোগী করে শ্রেণিকক্ষগুলি না সাজালে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ হবে কিভাবে? বর্তমানকে দয়া করিয়া ভবিষ্যতকে নিঃস্ব করার মতো দান-খয়রাতির ন্যায় বরাদ্দের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলিকে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠক্রিয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কিনা তা বিবেচনা করা দরকার।

যদিও শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্দ্ধারণ

Scanned with CamScanner

করা উচিত নয়, তবুও দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষাগুলির ফলাফলকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করে বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। তাই অভিভাবকরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নানা সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাটায়। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ পড়ে। ছেলে-মেয়ে-অভিভাবক উভয়েই প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তে কিভাবে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায় তার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের চাইতে প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেণ্টার, ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অভিভাবকের ভাবনা, মাধ্যমিকে ভাল ফল না করলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করা যাবে না। বিজ্ঞান বিভাগে না পড়লে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে না। ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার না হলেই যেন সব গেল গেল—এরকম ভাবনা অনেকের মধ্যে আছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মধ্যে। একটি বা বড়জোর দুটি সন্তান, তাই সন্তানকে যেন তেন প্রকারেন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার বানাতেই হবে। বাজারি ব্যবসায়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি হাতছানি দিচ্ছে। অভিভাবকরা ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির জন্য ইঁদুর-দৌড় প্রতিযোগিতায় সন্তানদের ঠেলে দেয়। কারণ সমাজে এই দুই পেশার কদর বেশি। অবশ্য অতি সম্প্রতি চিত্রটি কিছুটা পাল্টাচ্ছে। আসলে আমাদের সমাজে প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রতিভা অনুযায়ী শিশুর বিকশিত হওয়ার সুযোগ নেই। সুযোগ নেই যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার। আর সুযোগ নেই প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পাওয়ার। তাই অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে অথবা অজান্তে সমস্ত শিশুকে একই ছাঁচে ফেলে দেয়। ফলে কেউ বা সফল হয়, আর কেউ বা অসফলতার বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে নিজ-প্রতিভা ধ্বংস করে। চিরকালের জন্য বোকা হিসেবে নিজেকে বিবেচনায় রাখে। শিক্ষার জগৎ থেকে বিদায় নেয়। যে শিশুর কবি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাই, যার সাহিত্যিক হওয়ার প্রতিভা আছে তাকেও ইঞ্জিনিয়ার করতে চাই। যে শিশু সমাজবিজ্ঞানী হতে পারে, ঐতিহাসিক হতে পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে, গবেষক হতে পারে, আবিষ্কারক হতে পারে তাকেও ইঞ্জিনিয়ার করতে চাই। রবীন্দ্রনাথও ইঞ্জিনিয়ার হবে, গান্ধিজিও ইঞ্জিনিয়ার হবে আর হরগোবিন্দ খোরানাও ইঞ্জিনিয়ার হবে। আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিভা বিকাশের চাইতে দক্ষতার বিকাশ গুরুত্ব পায়। সব প্রতিভাকে একই মাপকযন্ত্রে যাচাই করে প্রতিভাবান বা মেধার বিচার করা হয়। ফলে প্রতিভাবানও বোকা বনে যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অতি প্রচলিত একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'Everybody is a genious. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its life believing that it is stupid.' অর্থাৎ 'প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। কিন্তু যদি আপনি একটি মাছকে গাছে চড়ার ক্ষমতা দিয়ে তার মেধার বিচার করেন, তাহলে সে যতদিন বাঁচবে, সে জানবে সে বোকা'।

Scanned with CamScanner

তথ্যসূত্র ঃ

1. Education and National Development : Report of the Education Commission 1964-66.
2. Flash Statistics (2014), Secondary Education in India : Progress towards Universalisation, New Delhi : NUEPA.
3. হালদার, কে. এবং নাথ, ই. (২০১৪), ভারতীয় শিক্ষার সাম্প্রতিক বিষয়, কলকাতা কে. চক্রবর্তী পাবলিকেশনস্।
4. Khandelwal B.P. (2002). 'Policy Issues in Secondary Education', In Rao, K.S. (Ed), Educational Policy in India : Analysis and Review of Promise and Performance, New Delhi : National Institute of Educational Planning and Administration.
5. Oxfam Briefing Paper (2014), Retrieve from https : www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working for-few-political-capture-economic-inequality-200114-en.pdf dated 15.10.2016.
6. Selected Educational Statistics 2014-15, MHRD, Govt. of India, Delhi.

● ড. কুতুব উদ্দিন হালদার
অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned with CamScanner